স্বামী চণ্ডিকানন্দ ও তাঁর সংগীত সাধনা

সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়

স্বামী চণ্ডিকানন্দের ফোটোটি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী গোপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের পুত্র শ্রী অভিজিৎ বিশ্বাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত

এই ধরাধামে কখনো কখনো এমন মানব অবতীর্ণ হন, যাঁরা আমাদের অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাসিয়ে দেন। তাঁদের পুণ্য জীবনকথায় আমাদের যুগপৎ বিস্মিত ও অভিভূত হতে হয়। অবশ্য এইসব পুণ্যশ্লোক মনীষীর প্রারম্ভিক জীবন এবং প্রান্তিক জীবন মেলানো ভার, যিনি চণ্ডাশোক তিনি তো পরিণত জীবনে ধর্মাশোক হয়ে জনচিত্তে মথিত হলেন। প্রকৃত কথা, একজন মানবের সমগ্র জীবনের ইতিবৃত্তের প্রেক্ষিতে জনমনে তাঁর বিকর্ষণ-আকর্ষণ চিহ্নিত হয়। তবে এ-কথাও সত্য, প্রাথমিক স্বেচ্ছাচারী মানুষ কালক্রমে আপনার কৃতকর্মের অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে পরবর্তী সময়ে জনগণের মঙ্গল কামনায় নিবেদিত হন। তিনি আত্মপ্রচারে বিমুখ হয়ে নীরবে-নিভৃতে সদা শুভ-কর্মপথে আপনাকে অন্বিত করেন। তিনি নির্মল আনন্দ নিয়েই সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের সাধনায় নিমগ্ন থাকেন। জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বনাম চণ্ডিকানন্দ মহারাজ তারই বিতত তুলন।

পূর্ববাংলার (অধুনা বাংলাদেশের) শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার বানিয়াচং গ্রামের বিদ্যাভূষণ পাড়ায় জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস উনবিংশ শতকের শেষ দশকে জন্মেছিলেন। তাঁর পিতা গিরিজা বিশ্বাস সমাজে রায়সাহেব হিসাবে পরিচিত এবং বিশাল ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর গ্রামে 'ভিলেজ কোর্ট' চালু করেছিলেন। অন্যদিকে মাতা সৌদামিনী দেবী স্ত্রীশিক্ষার প্রচারে-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মন-প্রাণ-হৃদয়ে অসাধারণ মহিলা ছিলেন। এককথায়, জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বাবা-মা পূর্ণ সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ ছিলেন। এই রায়সাহেবের শরিকি বাড়িতে দুর্গাপুজো হত। বিশাল নাটমন্দিরে দুর্গাপ্রতিমা বসিয়ে আত্মজন ও গ্রামের লোকজন আনন্দে মেতে উঠতেন।

১৯১৮ সালে শ্রীশ্রীসারদা দেবী (২২.১২.১৮৫৩-২১.৭.১৯২০) ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে এসেছিলেন। এই সময় স্নাতক শিক্ষার্থী জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন। এরপর জিতেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী হন। তাঁর নাম হয় স্বামী চণ্ডিকানন্দ। বলা বাহুল্য, তিনি আর স্নাতক শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত করেননি। কিন্তু জিতেন্দ্রনাথের সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের একটি সকরুণ ইতিহাস আছে।

দশম শ্রেণির ছাত্র নাবালক জিতেন্দ্রনাথ পিতার উপর আক্রমণকারী চরম শত্রু ছবু মিয়ার বাবাকে বর্শায় আহত করেছিলেন। কারণটি ছিল, বিদ্যাভূষণ পাড়ায় সরকারি পুকুরের পশ্চিম পারের ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকজন রায়সাহেব গিরিজার পুকুর-পাড় দিয়ে গবাদি পশুকে পাড়ার পশ্চিমের বিস্তীর্ণ মাঠে নিয়ে যেত। গবাদি পশুর চলাচলের পথটি গোপাট হিসেবে চিহ্নিত ছিল। এই নিয়ে গিরিজাবাবু আপত্তি জানালে ছবু মিয়ার বাবা তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করে। সেই মতো ছবু মিয়ার বাবা গিরিজা বিশ্বাসকে এক শীতকালের সন্ধ্যায় আপাত অনাবিল বন্ধুত্বের দাবিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধারালো দা দিয়ে বারংবার আঘাত করে। এর ফলে গিরিজা বিশ্বাস মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পিতার এই বিপন্নতায় পুত্র জিতেন্দ্রনাথ ছবু মিয়ার বাবাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করেন। এই অপকর্মের জন্য নাবালক হিসেবে তাঁর একদিনের জেল হয়েছিল। মতান্তরে এ-কথাও শোনা যায়, তাঁর কোনো সাজা হয়নি। এইটুকুই জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞানগত তথ্য মিলেছে। এঁর বাকি জীবন স্বামী চণ্ডিকানন্দ হিসেবে আত্মীয়-পাঠক-উত্তরসাধকের কাছে সুবিদিত।

পিতার মর্মান্তিক দৃশ্য এবং নিজকৃত অপকর্মের অনুশোচনা জিতেন্দ্রনাথের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে এল। বোধ করি তিনি বুঝেছিলেন, পিতৃমাতৃদত্ত 'জিতেন্দ্রনাথ' নামটির সুগভীর ব্যঞ্জনাকে যথাযথ মর্যাদা দিতে হলে জগৎপ্রপঞ্চে আশ্লিষ্ট হলে চলবে না। তাই তিনি দেবীমাহাত্ম্য-কথায় অপার আনন্দে নিমগ্ন হওয়ার বাসনায় জগজ্জননী সারদার কাছে দীক্ষান্তে চণ্ডিকানন্দ নামটি গ্রহণ করলেন। আর রূপ নয়, যৌবন নয়, ধন নয়, যশ নয়, প্রথাগত শিক্ষাও নয়; এখন আত্মোপলব্ধি আর সর্বমানবের হিতসাধন হল তাঁর পথ ও পাথেয়। বিশেষত তিনি স্বামী শিবানন্দের কাছে সন্ন্যাস লাভ করার পর তাঁর চিত্তের অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে-সব সন্ন্যাসী কণ্ঠসংগীতে ও সংগীত-রচনায় নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন, স্বামী চণ্ডিকানন্দ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইনি প্রতিদিন তাঁর জীবন-দেবতার উদ্দেশে সুমধুর সংগীত-লহরি উৎসর্গ করেছেন, সংগীতের ভাববন্যায় নিজে ভেসেছেন, সবাইকে ভাসিয়েছেন।

এঁর আসল কর্ম শিশুজগতে বাস করে তাদের মানুষ করা। ১৯১৮ সালে রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশের পর ইনি যেখানেই বাস করতেন সেখানেই শিশুদের নিয়ে থাকতেন। তাদের জন্য আদর্শ সংঘ প্রস্তুত করেছিলেন। তাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করতেন।

বহু বাঙালি, অসমিয়া, খাসি, নেপালি এঁর ভাবে অনুপ্রাণিত। ইনি খাসি ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন।

স্বামী চণ্ডিকানন্দের সব গ্রন্থই আজ দুষ্প্রাপ্য। 'পাঞ্চজন্য' গ্রন্থটিই (প্রকাশক 'উদ্বোধন' কার্যালয়, ১ উদ্‌বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা : ৭০০ ০০৩, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, মে ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৯) পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে স্বামী নিরাময়ানন্দ লিখেছেন, "ভগবৎ কৃপায় পাঞ্চজন্যের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণে সঙ্গীতকার স্বামী চণ্ডিকানন্দজির স্বরচিত ৬৪টি গান ছিল। উহাদের অধিকাংশ বর্তমান সংস্করণে 'বিবেক গীতি'-শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে; কিছু গান অন্যান্য অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং নূতন কয়েকটি গান সংযোজিত হইয়াছে। গানগুলিকে নূতন ভাবে সাজানো হইয়াছে এবং প্রথম অধ্যায়ে ৫৬টি গান স্থান পাইয়াছে। এতদতিরিক্ত নিম্নলিখিত নয়টি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে—

মাতৃসঙ্গীত, শিবসঙ্গীত, গুরুসঙ্গীত, মহামানবসঙ্গীত, রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, লীলাগীতি, সারদা-লীলাগীতি, বিবিধ সঙ্গীত ও প্রতিধ্বনি।"

প্রতিধ্বনি অধ্যায়ের সদুত্তরও স্বামী নিরাময়ানন্দ দিয়েছেন— "এই গ্রন্থের 'প্রতিধ্বনি'-অধ্যায় সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। বাংলা সঙ্গীতপুস্তকে হিন্দী, কানাড়া, গুজরাটি, ওড়িয়া, খাসিয়া, অসমিয়া প্রভৃতি গানের সংকলন কেন করা হইয়াছে, এই প্রশ্ন অনেকের মনে জাগা স্বাভাবিক। গ্রন্থকার অর্ধ শতাব্দী যাবৎ বাঙলা ছাড়া অন্য ভাষাতেও গান গাহিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার গান প্রাদেশিকতা বর্জিত হওয়ায় উহা গাহিয়া এবং শুনিয়া ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। আমাদের বিশ্বাস— ভারতে জাতীয় সংহতি সাধনের পথে 'প্রতিধ্বনি'-অধ্যায়টি যথেষ্ট সাহায্য করিবে।" (প্রাগুক্ত 'নিবেদন' অংশ, ৩০ জানুআরি ১৯৭০, পৃষ্ঠা খ)

পাঞ্চজন্য গ্রন্থটি নিয়ে এটুকু হল প্রাথমিক কথা। পরে এই গ্রন্থ নিয়ে আরও আলোচনা হতে পারে। স্বামী চণ্ডিকানন্দের অন্যান্য গ্রন্থ হল 'ছেলেদের গান' (প্রকাশক শ্রীদেবেন্দ্রকুমার শ্যাম, মডার্ন বুক ডিপো, শ্রীহট্ট, প্রথম সংস্করণ ১৩৩৮), এই গ্রন্থটির আরও তিনটি সংস্করণ (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪১, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৪৬, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৫৩) হয়েছিল। ছেলেদের গান বইটি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, কীর্তন, বাউল প্রভৃতি সংগীত সমন্বিত। গ্রন্থটিতে 'মাতৃসঙ্গীত', 'শিবসঙ্গীত', 'বিবিধ সঙ্গীত' ও 'মহামানবসঙ্গীত' নামক চারটি বিভাগ রয়েছে।

'সারদা-সঙ্গীত' (প্রথম সংস্করণ শ্রীশ্রীফলহারিণী কালিকা পূজা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯) গ্রন্থটি রামকৃষ্ণ মিশন, শিলং থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে গ্রন্থকার চণ্ডিকানন্দ স্বামী লিখেছেন, সারদা মায়ের আগতপ্রায় শতাব্দী জন্মজয়ন্তী (১২৬০-১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) উপলক্ষ্যে গানগুলি রচিত। স্বামী প্রেমেশানন্দ ভূমিকায় লিখেছেন, "আত্মবিস্মৃত সন্তানদিগকে কোলে তুলিয়া নিবার জন্য আমাদের মা বারবারই মানব দেহ ধারণ করিয়াছেন। এবারকার প্রকাশ সর্বাধিক সমুজ্জ্বল। তাঁহার অনুপ্রেরণাধীন হইয়া শ্রীমৎ স্বামী চণ্ডিকানন্দজী যে সব মহিমা-কীর্ত্তন সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহা পাঠক গায়ক শ্রোতা সকলেরই কল্যাণ সাধন করিবে।" (বেলুড় মঠ, ৬ বৈশাখ ১৩৫৯)

স্বামী চণ্ডিকানন্দের 'সারদা-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গীতি' গ্রন্থটি আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম থেকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিককে (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) স্মরণে রেখে উক্ত সনে প্রকাশিত হয়েছিল। 'সারদা-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গীতি' গ্রন্থটি (১৯৬২) রচনার আগেও তিনি আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থটি হল 'তরুণের গান' (প্রকাশক-সম্পাদক স্বামী সৌম্যানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন, শিলং, প্রকাশের তারিখ ২৮.৬.১৯৫৬)। 'উদ্বোধন' পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ ১ মাঘ ১৩০৫, পত্রিকাটি প্রথমে পাক্ষিক ছিল, প্রথম সম্পাদক ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীত, দশম বর্ষ ১৩১৪-১৩১৫ থেকে 'উদ্বোধন' পত্রিকা মাসিকপত্র হিসেবে রূপান্তরিত হয়।) সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 'তরুণের গান' বইটির সংক্ষিপ্ত-মর্মস্পর্শী ভূমিকা লিখেছেন। এই ভূমিকাটি হল—

"শ্রদ্ধেয় স্বামী চণ্ডিকানন্দজির 'তরুণের গান' সঙ্গীতের মাধ্যমে বাঙ্গলার তরুণ-তরুণীদের প্রাণে ভগবদ্ভক্তি ও সুদৃঢ় নৈতিক চরিত্রের পরিপোষক— শুচিতা, স্বার্থত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা, সাহস প্রভৃতি সদ্‌গুণ এবং মানব সেবা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করিবার একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা। লেখক এই প্রচেষ্টায় যে বহুলাংশে সফল হইয়াছেন তাহা পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ গীতগুলি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি নিজে একজন সুদক্ষ সঙ্গীত-

গুণী এবং দীর্ঘকাল ছাত্রছাত্রীদের সংস্পর্শে থাকিয়া তরুণ মনস্তত্ত্বে পারদর্শী। এই অভিজ্ঞতা তাঁহার রচনায় সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

"উচ্চ আদর্শের প্রতি প্রীতি এবং উহার অনুশীলনের জন্য অনলস অধ্যবসায় দেশের ভাবী মানুষদের ভিতর যাঁহারা উদ্বুদ্ধ করিবার সাধনা গ্রহণ করিয়াছেন স্বামী চণ্ডিকানন্দ তাঁহাদের একজন। তাঁহাকে এবং তাঁহার 'তরুণের গান'কে অভিনন্দিত করি।"

'বিবেকানন্দ-লীলাগীতি' (দুটি পর্ব) কথিকা সহ গ্রন্থটির প্রকাশক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (সম্পাদক, স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী, ১৬৩ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা : ৭০০০১৪, প্রকাশকাল জুলাই ১৯৬২)। গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে স্বামী চণ্ডিকানন্দ লিখেছেন, "যাঁহার আশীর্বাদ, উৎসাহ ও প্রেরণায় এই লীলাগীতি রচনা সম্ভব হইয়াছে, সেই পরম পূজনীয় সঙ্ঘগুরু বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর করকমলে।" তিনি 'নিবেদন' অংশে আরো লিখেছেন, সাধারণ সম্পাদক সম্বুদ্ধানন্দজি গ্রন্থখানি প্রকাশের ভার গ্রহণ করায় তা বহুল প্রচারের পথ সুগম হয়েছিল। শিলঙের বহুজন-শ্রদ্ধেয় শিক্ষাব্রতী অশ্বিনীকুমার শর্মা পুস্তকখানির কথিকা অংশগুলি লিখে দিয়েছিলেন। চণ্ডিকানন্দের রচিত নয় এরূপ কয়েকজনের সংগীতও পুস্তকে ব্যবহৃত হয়েছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, স্বামী সারদানন্দ, তুলসীদাস, সুরদাস, যদু ভট্ট, অশ্বিনীকুমার শর্মা ও স্বামী প্রেমেশানন্দ। এমন-কি বৈষ্ণব পদকর্তা জ্ঞানদাসের একটি পদ ('যদি গোকুল-চন্দ্র ব্রজে না এলো') এখানে প্রাসঙ্গিকতায় সংকলিত হয়েছে।

স্বামী চণ্ডিকানন্দের স্বরলিপি সহ 'ভজন সঙ্গীত' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ভূমিকায় এই গ্রন্থ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণরতন জনকর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এই 'ভজন সঙ্গীত' গ্রন্থের পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণের (প্রথম ভাগের পূর্বাংশ, প্রকাশক : স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, অধ্যক্ষ, শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটি, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, প্রকাশকাল ১৩৮২ বঙ্গাব্দ) 'উৎসর্গ' পত্রে 'চিরপ্রণত সেবক' চণ্ডিকানন্দ লিখেছেন, "আমার পরম পূজনীয় সঙ্গীতগুরু শ্রীমৎ স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজের শ্রীশ্রীকরকমলে উৎসর্গ করিলাম।" গ্রন্থটিতে সহজ উপায়ে সংগীত শিক্ষার প্রণালি দেওয়া আছে।

প্রসঙ্গত আমাদের মনে রাখা ভালো, স্বামী চণ্ডিকানন্দের 'গীতাবলী' গ্রন্থটির দুটি সংস্করণ হয়েছিল। গ্রন্থটিতে প্রাচীন ও আধুনিক লেখকগণের সংগীত সংকলিত হয়েছে।

স্বামী চণ্ডিকানন্দ খাসি ভাষা জানতেন। তাঁর খাসি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলি হল— Ka Jingrwai India (Students' edition), Ka Jingrwai Kyrsiew, U. Ramkrishna, Ka Sarada Devi (ka la jan mih), U Swami Vivekananda (Kan Sa mih)।

এই হল স্বামী চণ্ডিকানন্দের গ্রন্থগুলির সাধারণ পরিচয়। এবার তাঁর জনহিতকর কাজগুলিও আলোচিত হতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, চণ্ডিকানন্দের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল শিশুজগতের উন্নতি সাধন। সুনামগঞ্জ শহরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর তার পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। অনেক অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবক ও ভক্তদের নিয়ে ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য ওষুধ বিতরণ ও আর্তের সেবা করতেন। তিনি রোগীদের জন্য একটি নার্সিং ক্লাব ও সৎকার্য সমিতি গঠন করেছিলেন। ১৯৬৫-৬৬ সালে শিলং রামকৃষ্ণ মিশন থেকে স্বামী চণ্ডিকানন্দের লেখা একটি বিজ্ঞাপন 'মানুষ হও' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। বিজ্ঞাপনটি চোদ্দ-পনেরো সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রতিটি সংখ্যার মূল আবেদন ছিল— আমাদের প্রকৃত মানুষ হতে হবে। শিলং রামকৃষ্ণ মিশনে থাকাকালীন তিনি মিশনের ভাবধারায় উজ্জীবিত করার জন্য মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে গান শেখাতেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁর কপালেও অপবাদ জুটেছিল। কোনো কোনো মহারাজ তাঁর সম্বন্ধে চরিত্রহীনতার কথা তোলেন। এই অমূলক নিদারুণ অপবাদ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তিনি রামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এর পর বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ তাঁকে বেলুড় মঠে নিয়ে আসেন এবং সেখান থেকে তাঁকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠান। সেখানে তিনি শিশুদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তবে বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধবয়সে তাঁকে বেলুড় মঠে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশ্রমাবাসে বিশ্রামের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বার্ধক্যজনিত স্বল্প রোগভোগের পর স্বামী চণ্ডিকানন্দ ২৭ জানুআরি ১৯৮৩ সালে কলকাতার রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানে রামকৃষ্ণলোকে অনন্তকালের জন্য ধ্যানস্থ হলেন।

স্রষ্টার জীবনদীপ নির্বাপণের পর তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টি ও সৃষ্টির দিকটি ভাবীকালের পাঠক ভেবে দেখেন এবং পাঠকের সেই ভাবনায় স্রষ্টার সৃষ্টির ক্ষণত্ব-স্থায়িত্ব নিরূপিত হয়। স্বামী চণ্ডিকানন্দও এই নিয়মে মানবসমাজে অন্বিত।

মহামানবের সকল কর্মকাণ্ড আমরা ভুলে যেতে পারি। কিন্তু ভুলতে পারি না তাঁর এমন কিছু সৃষ্টিসাধনা যা আমাদের শ্রদ্ধার আসনে তাঁকে উপনীত করে। স্বামী চণ্ডিকানন্দ শুধু সংগীতের জন্যই মানবহৃদয়ে অমরত্ব লাভ করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-কথা খুবই জরুরি। তিনি লিখেছেন, "আমি যখন গান বাঁধি তখনই সবচেয়ে আনন্দ পাই। মন বলে— প্রবন্ধ লিখি, বক্তৃতা দিই, কর্তব্য করি, এ সবই এর কাছে তুচ্ছ। আমি একবার লিখেছিলাম—

যবে কাজ করি— প্রভু দেয় মোরে মান;

যবে গান করি— ভালোবাসে ভগবান।

এ কথা বলি কেন? এইজন্যে যে, গানে যে-আলো মনের মধ্যে বিছিয়ে যায় তার মধ্যে আছে এই দিব্যবোধ যে, যা পাবার নয় তাকেই পেলাম আপন করে নতুন করে।" (আলাপ-আলোচনা, রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার রায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, তারিখ ৯ জুন ১৯৩৮, গ্রন্থ : সংগীত, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, চতুর্দশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৪৫)

স্বামী গম্ভীরানন্দ 'পাঞ্চজন্য' গ্রন্থের (চণ্ডিকানন্দ প্রণীত, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯) ভূমিকায় লিখেছেন, "ভাবের বাহক ভাষা; সেই ভাষা সুরে-ছন্দে ঝঙ্কৃত হয়ে মানব-হৃদয়ে দোলা দেয়, তখনই হয় ভাবের পরিপূর্তি। তাই ভাবোদ্দীপনায় সঙ্গীতের মত ললিতকলার প্রভাব অভাবনীয়। সঙ্গীত-কুশলী স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'মনুষ্য-মনের উপর সঙ্গীতের অসাধারণ প্রভাব, উহা মুহূর্তে একাগ্রতা আনিয়া দেয়। অতিশয় তামসিক জড় প্রকৃতি ব্যক্তিরা— যাহারা এক মুহূর্তও নিজেদের মনকে স্থির করিতে পারে না, তাহারাও উত্তম সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া থাকে। এমন কি কুকুর, বিড়াল, সর্প, সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণও সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইয়া থাকে।'"

এইসব কথায় প্রমাণিত হয় যে, সংগীতবিদ্যার মতো অপর কোনো বিদ্যা নেই। আর এই সংগীতবিদ্যায় স্বামী চণ্ডিকানন্দ অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল জনচিত্ত মথিত করেছিলেন। তাঁর গানের ভাষা ছিল সহজ, ভাবের গভীরতা ছিল অতলস্পর্শী। তিনি সংগীত রচয়িতা, সুরকার ও গায়ক ছিলেন। তাঁর রচিত সাবলীল গানগুলি মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে স্পন্দন সৃষ্টি করায়। সাঁওতাল, খাসি, নাগা, মিজো, মিকির, মিরি, রাজবংশী, মণিপুরি, নেপালি প্রভৃতি ভাষায় তাঁর রচিত গানগুলি প্রশংসা লাভ করে। এমন-কি ভারতের বাইরেও তাঁর রচিত গানগুলি সমাদৃত হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান সকলেই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তাঁর সংগীতকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। আসল কথা, এই পাগল-প্রেমিক-সাধক-চণ্ডিকানন্দের অন্তরের সাধনাই তো ছিল সংগীত।

'ছেলেদের গান' (চতুর্থ সংস্করণ ১৩৫৩) গ্রন্থটিতে মোট ২৭৮টি সংগীত রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ 'আশীর্বাণী'-তে সংগত কারণেই লিখেছেন, "এই গানগুলির সহজ ও সুললিত রচনা ও সুর বিন্যাসের মধ্যে তরুণ প্রাণে উচ্চ ভাব ও আদর্শ উদ্দীপিত করিবার একটা বিশেষ শক্তি আছে।" (শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, লখনউ, ১০ এপ্রিল ১৯৪৫)

মায়ের রূপ ও স্বরূপ ছোটদের কাছে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য তাঁর শিব ও রুদ্র ভাবটিই 'ছেলেদের গান' গ্রন্থে বেশি স্থান জুড়ে আছে। মাকে শুধু বরাভয় রূপে দেখলে চিত্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁকে ভয়ংকরীরূপে দেখতে শেখা ছেলেবেলাতেই আরম্ভ হওয়া উচিত। এতে চিত্ত দৃঢ় ও সবল হয়, সাহস বাড়ে— ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিকূল পরিবেশে ছেলেরা মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি পায়। আর মায়ের শিবভাব বা মঙ্গলরূপ তো তাঁর সন্তানের প্রতি থাকবেই। চণ্ডিকানন্দ ঠিকই বুঝেছেন, ছেলেদের কাঙ্ক্ষিত মন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হতে চায়। চণ্ডিকানন্দের বাণীতে তাই আমরা ছেলেদের অন্তরের কথা শুনি—

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর সন্তানে তব আজ।
আশীর্বাদের বর্ম পরাও ঘুচায়ে দৈন্য সাজ।

('মাতৃসঙ্গীত', পৃষ্ঠা ৫৮)

ছেলেরা হৃদয়ের শোণিতকে তপ্ত করে, ভীতির অশ্রুকে বিদূরিত করে বিশ্বসভায় দেশের মায়ের মান রক্ষায় নিজেকে উৎসর্গ করতে চায়। কারণটি ছেলেদের কাছে অতি স্পষ্ট—

মানুষ আমরা নহি ত মা'হীন
তুই যার মা' সে কি কভু দীন

তবে কেন মিছে পড়ে থাকা পিছে
কেন এ অলীক লাজ। (প্রাগুক্ত)

দেশের সংকট সময়ে তারা মায়ের রুদ্ররূপ দেখতে চায়—

এসো এসো এসো এসো মা' আমার
দশপ্রহরণ ধারিণী
হাস মা' অট্ট অট্ট হাস্য
ভূলোক দ্যুলোক নাদিনী। (প্রাগুক্ত)

ছেলের দল মায়ের রুদ্ররূপে অভিষিক্ত হয়ে যা করবে তা হল—

(মোরা) করি বিদূরিত স্বার্থ দ্বন্দ্ব
সাধিয়া তোমারি কাজ।। (প্রাগুক্ত)

ভারতের পরাধীনতা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বঙ্গবিভাগের অপচেষ্টা স্বামী চণ্ডিকানন্দের চিত্তকে অশান্ত করেছিল। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন আমাদের দেশে আমরাই বিপন্ন। সমকালের ভাবনায় ভাবিত হয়ে, নিঃস্বার্থভাবে দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে একমাত্র ছেলের দলই এগিয়ে যেতে পারে। তাই ছেলেদের মনের কথা তাঁর কলমে উঠে এসেছে—

পথের 'পরে বিপদ পেলে
দলতে পারি পদতলে
(মোদের) হুংকারেতে সাগর শুকায়
পাহাড় পড়ে ঢলে।। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩)

কারণ ছেলের দল অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত। তারা মা-অভয়ার সন্তান। তারা বিশ্ব বিজয় অভিযানে তৎপর। কারণ—

ত্যাগের বর্ম অঙ্গে মোদের
নাহি নাহি ভয় আর মরণের
সেবার শাণিত কৃপাণে আমরা
নাশিব অ-শিবে এ বসুধার।
('বিবিধ সঙ্গীত', পৃষ্ঠা ৬৮)

এই ছেলেদের প্রতিজ্ঞা একনিষ্ঠতায় অনাবিল—

নব জাগ্রত ভারত মাতার সন্তান মোরা উচ্চশির
মুছাব আমরা ধরার কালিমা সঞ্চিত শত শতাব্দীর।
(প্রাগুক্ত)

ছেলেরা বিবেকানন্দকে তাদের সেনাপতি হিসেবে জেনেছে, মা অভয়ার বাণী শুনেছে, এখন তারা নির্ভীক মাভৈঃ মন্ত্রে দীক্ষিত—

বিবেকানন্দ সেনাপতি ঐ
হুংকারে ঘন "মাভৈঃ মাভৈঃ
সব সন্তান হও আগুয়ান
পশ্চাতে ফিরে চেয়ো না আর।।"
(প্রাগুক্ত)

এখন তারা বুঝেছে চলাই জীবন, থেমে থাকাই মৃত্যু—

শুনেছি এবার অভয়ার বাণী
গেল সংশয় চিত্তের গ্লানি
আর কারে ভয় আর কারে মানি
যাই যাই পড়ে রব না আর। (প্রাগুক্ত)

এই ছেলেরা তো বীরের জাত। তারা রণে দুর্দম। বিপদ তাদের কাছে নিছক খেলা। আরো ভালো করে জানে, তারা উত্তরপুরুষ হিসেবে পূর্বপুরুষের পূতরক্ত শরীরে বহন করে চলেছে। তারা মহাভারত, উপনিষদ, পুরাণ পাঠান্তে গর্বিত। তাদের বংশলতিকায় আছেন ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, মুনি দধীচি ও নচিকেতা। কাজেই দেশের সংকটে ছেলেরা শপথ নিচ্ছে—

আজ কি তুচ্ছ স্বার্থে মজে
থাকব মোরা ভয়ে লাজে?
দেশের সেবায় দেব এবার
আত্ম বিসর্জন।। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯)

ছেলেরা শক্তিতে কম নয়। কারণ তারা মহামায়ার জাত। ইন্দ্র-চন্দ্র-যম তাদের ভয়ে কেঁপে মরে। তাদের সীতার চোখের জলে লঙ্কাপুরীর রাক্ষসরাজ রাবণ সবংশে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, দ্রৌপদীর অভিশাপে দুর্যোধনকে নানা যন্ত্রণা নিয়ে মরতে হয়েছে। তাই ছেলেরা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করে—

আমরা যখন মনে করি
অসি ধরি নাশি অরি
দেশের তরে হেসে করি
আত্মবিসর্জন।। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭০)

ছেলেরা বিশ্ববোধে অন্বিত। তাই তারা অবাধে বলতে পারে—

বীর মোরা সবাই— বীর সবাই
বিশ্বরাজার ছেলে মোরা— আমরা সবে ভাই।।
ভালো কাজে সবার আগে

আমরা ছুটে যাই
মন্দ যাহা মিথ্যা যাহা
আমরা তাতে নাই।। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭১)

আমরা আমাদের প্রাণেষ্ট পরমেশকে মন্দিরে-স্বর্গে খুঁজে বেড়াই। তাঁর স্থান তো আমাদের হৃদয়ে, তিনি তো অন্তর্যামী, তাইচণ্ডিকানন্দের ছেলের দল প্রাথমিক ভুল শুধরে বলে ওঠে—

ভেবেছিলুম লুকিয়ে আছ
স্বর্গেতে আর মন্দিরে।
আজকে দেখি ব্যক্ত তুমি
সবার 'আমি'র অন্তরে।।
ব্রহ্ম হতে পরমাণু
সকলি তো তোমার তনু
সেব্য তুমি সেবক তুমি
ব্যাপ্ত লোক লোকান্তরে।।

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৬)

ছেলেদের মধ্যে কোনো প্রচ্ছন্নতা নেই, কপটতা নেই। তারা সত্যকে সহজে বরণ করে নিতে পারে—

ধন্য হল আমার জীবন
খুলল এবার অন্ধ নয়ন
সফল হল জন্ম মরণ
আমাতে তোমায় হেরে।। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৬)

ছেলেরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তারাই আগামী দিনে দেশের কর্ণধার। ছেলেবেলা তো চেতনা-প্রত্যুষের কাল। তাই তাদের প্রাণময় প্রার্থনা—

শৌর্য দাও বীর্য দাও নবীন জীবন দাও
পরা অপরা বিদ্যা দাও দিব্য চেতন দাও।।

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮০)

জীবন দেবতার কাছে ছেলেরা কর্মে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি, নির্মল শুভবুদ্ধি, দিব্য চেতনা, জ্ঞান গরিমা, ত্যাগে মতি ও সেবাতে প্রীতি প্রার্থনা করে। তারা স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-ভেদবুদ্ধি চিরতরে মুছে ফেলতে চায়। তাদের প্রাণের ঠাকুরের কাছে আত্মনিবেদনের ভাষা হল—

এ নব যুগের নবীন তন্ত্রে দীক্ষিত কর মিলন মন্ত্রে
সার্থক কর জীবন মোদের চরণে শরণ দাও।।

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮০)

কালের অনিবার্য নিয়মে ছেলেরা একসময় নবযৌবন লাভ করে। তারা সমাজের নানা অসাম্যের প্রতিবিধান করতে না-পারার বেদনায় ব্যথিত হয়। এ-কথা স্বামী চণ্ডিকানন্দ কিশোরের সম প্রাণ নিয়ে বুঝেছেন। তাই তাঁর 'তরুণের গান' (প্রথম প্রকাশ : ২৮.৬.১৯৫৬) গ্রন্থটির পাতায় পাতায় পরান জাগানোর প্রাণময় মন্ত্রোচ্চারণ। স্বামী চণ্ডিকানন্দ মনে-প্রাণে সংগীতসাধক। তিনি বোঝেন, কথা-সুর-তাল-লয়ে অন্বিত সংগীত সকল মানবকে সমপ্রাণে অন্বিত করে। তাই তাঁর 'তরুণের গান'-এর প্রস্তাবনা সংগীতময়। যা কালের প্রেক্ষিতে তরুণ-ভাবনায় নিবেদিত। তিনি এমন গান আর গাইবেন না, যা তরুণের ঘুম পাড়ানোর সহায়ক হয় এবং হতাশার ব্যথায় তাদের প্রাণ কাঁদায়। তরুণের মনোবল হরণ করার মতো আর কোমল গান নয়। কারণ তাতে আছে সুরা সেবনের মতো আচ্ছন্নতা। তাই তাঁর জীবন-বীণায় মহারুদ্রতানে সুরের মূর্ছনা ওঠে—

গাইব আজি মেঘমন্দ্রে
আশার গীতি নবীন ছন্দে
বাজাব আজ জীবন বীণায়
মহা রুদ্রতান।
জাগবে পরান থাকবে না ভয়
ঘুচবে লজ্জা হবেরে জয়
জীবন মরণ সফল হবে
হাসবে ভগবান।।

প্রসঙ্গত মনে রাখা ভালো, 'তরুণের গান' (প্রথম প্রকাশিত : মহালয়া ১৩৬৩) বইটিতে এই গানটি ('গাইব না আর নিরাশ ভরা') 'প্রস্তাবনা' অংশে আছে। আবার 'ছেলেদের গান' (পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ ১৩৫৩) বইটিতে এই একই গান ৫৯তম গান হিসেবে ছিল। কিন্তু 'পাঞ্চজন্য' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে (মাঘ ১৩৯২, ফেব্রুআরি ১৯৮৬) এবং তৃতীয় পুনর্মুদ্রণে (জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, মে ২০১১) গানটি 'বিবেকগীতি' অংশে (উভয় গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায়) স্থান পেয়েছে। সেখানে সূচিপত্রে অথবা গ্রন্থের কোথাও 'তরুণের গান' অথবা 'ছেলেবেলার গান' কথাটির উল্লেখ নেই। 'পাঞ্চজন্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) শুধু 'বিবেক-গীতি' অংশটুকু আছে। সেখানেও উক্ত গানটি নেই। আবার 'ছেলেদের গান' ও 'তরুণের গান' বই দুটিতে ২৯টি গান একই আছে। গানগুলি হল—

গান	ছেলেদের গান (চতুর্থ সংস্করণ ১৩৫৩)	পৃষ্ঠা	তরুণের গান (মহালয়া ১৩৬৩)	পৃষ্ঠা
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর	মাতৃসঙ্গীত	৫৮	বিভাগ নেই	১৭
অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা	বিবিধ সঙ্গীত	৬৮	বিভাগ নেই	৪
আবার যদি এলে হরি	মহামানবসঙ্গীত	১৪০	বিভাগ নেই	৩১
আমরা মহাবীরের জাত	বিবিধ সঙ্গীত	৬৯	বিভাগ নেই	২
আমরা মহামায়ার জাত	বিবিধ সঙ্গীত	৭০	বিভাগ নেই	৩
আমরা সবে তাঁরি ছেলে	বিবিধ সঙ্গীত	৭২	বিভাগ নেই	৭
আলোর দেশের যাত্রী মোরা	বিবিধ সঙ্গীত	৭৭	বিভাগ নেই	৮
কে তুমি তাপস কাঁদিছ কাতরে	মহামানবসঙ্গীত	১৩২	বিভাগ নেই	৩৪
কে বলে রে আমরা পাপী	মাতৃসঙ্গীত	২০	বিভাগ নেই	৯
ক্ষাত্রবীর্য ব্রহ্মতেজ মূর্তি ধরিয়া	মহামানবসঙ্গীত	১১৪	বিভাগ নেই	২৭
গাইব না আর নিরাশ ভরা ঘুম পাড়ান গান	বিবিধ সঙ্গীত	৭৮	বিভাগ নেই	(প্রস্তাবনা)
জগত জননী জাগিয়াছে আজি	মাতৃসঙ্গীত	৩৯	বিভাগ নেই	১৬
জাগিল জননী আজি, জাগো	মাতৃসঙ্গীত	৩৪	বিভাগ নেই	১৫
'জাগো জাগোরে' বলে কে ঐ ডাকিছে রে	মহামানবসঙ্গীত	১১২	বিভাগ নেই	২৮
তুমি কি গো শুধু খেয়েছিলে ননী	মহামানবসঙ্গীত	১০০	বিভাগ নেই	৩৮
দাও তেজ তেজোময় চিত্তে আমার	বিবিধ সঙ্গীত	৮০	বিভাগ নেই	৪৮
দানব-দলনী জননী মোদের দানবের ভয়	মাতৃসঙ্গীত	৫৭	বিভাগ নেই	১৮
পাঞ্চজন্য শোন, শোন সবে পাতি কান	মহামানবসঙ্গীত	১৩৪	বিভাগ নেই	৩২
বাজাও বাজাও আবার বাজাও	মাতৃসঙ্গীত	৬১	বিভাগ নেই	৩৬
বীর মোরা সবাই— বীর সবাই	বিবিধ সঙ্গীত	৭১	বিভাগ নেই	৬
বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ	মহামানবসঙ্গীত	১১৩	বিভাগ নেই	২৫
মরণ আর কি দেখাও ভয়	মাতৃসঙ্গীত	২৫	বিভাগ নেই	৪২
মরতে হবে পরের তরে	বিবিধ সঙ্গীত	৭৬	বিভাগ নেই	৪২
মুণ্ডমালা ফেলে কেন সাজলি মা তুই বনমালী	বিবিধ সঙ্গীত	৭৯	বিভাগ নেই	১২
রাখ মোরে তব বাহিনীতে প্রভু	বিবিধ সঙ্গীত	৯০	বিভাগ নেই	৪৮
লক্ষ প্রাণের দুঃখ যদি	বিবিধ সঙ্গীত	৭৪	বিভাগ নেই	১০
শৌর্য দাও বীর্য দাও নবীন জীবন দাও	বিবিধ সঙ্গীত	৮০	বিভাগ নেই	৪৭
সকল দেশের ভগবান	মহামানবসঙ্গীত	১৪২	বিভাগ নেই	৫০
সিংহ বাহিনী জননী মোদের	মাতৃসঙ্গীত	৫৫	বিভাগ নেই	২০

এই গানের পরিসংখ্যানের কারণ হল স্বামী চণ্ডিকানন্দের 'তরুণের গান'-এ কার্যত ১৬টি নতুন গান রয়েছে। বাকি ২৯টি গান 'ছেলেদের গান' থেকে সংকলিত হয়েছে। শৈশবের অবোধ দুর্মর স্মৃতিকে সত্য অন্বেষণে জাগরূক করা সংগীতসাধকের লক্ষ্য ছিল। তরুণের গানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নতুন গানগুলি হল— 'আমরা তরুণ দল', 'এক হব তব পতাকাতলে',

'নিশিদিন নিজের সুখের লাগি', 'বাজাও বাজাও ডঙ্কা বাজাও', 'বিবেক আহ্বান এসেছে', 'ভারত আমার জননী আমার', 'মা আমাদের মানুষ কর', 'দেবতাই মানুষ', 'এ মহা বারতা', 'শৌর্য দাও শক্তি দাও', 'সামনে যা এগিয়ে যা সন্তান সব আজ'।

এইসব গানের প্রতিটিতে তরুণদের দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ করবার গভীর বাণী আছে। স্বামী চণ্ডিকানন্দ সহজ অথচ নিটোল কথায় 'মানুষই দেবতা' (পৃষ্ঠা ৩৩) এ-কথা বলতে চেয়েছেন। তাঁর আত্মোপলব্ধির ভাষা সর্বজনীন—

আপনারে যবে করি অপমান
অন্তরে বসে কাঁদে ভগবান
তোমাতে আমাতে নাহি ব্যবধান
জেনে এ তত্ত্ব জাগিল প্রাণ।

(তরুণের গান, পৃষ্ঠা ৩৩)

স্বামী চণ্ডিকানন্দের 'সারদা-সঙ্গীত' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯) বাৎসল্য রসের আকর গ্রন্থ। এখানে সংগীত-সাধক মায়ের স্নেহের মধ্য দিয়ে শিশু যে কী পরম বিস্ময় ধারণ করে তা ৬৫টি গানে অপরূপভাবে চিত্রিত করেছেন। 'সারদা-সঙ্গীত'-এর প্রথম গানে আছে সন্তানের জন্য মায়ের চিত্ত আকুল—

কে ডাকে আয় আয় বাছা ফিরে আয়
মোর তরে সদা কার আঁখি ঝরে করুণায়।।

শেষ গানে আছে সন্তানের সহজ-গভীরভাবে মাকে পাওয়ার আকুতি আর অকপট আত্মসমর্পণ—

তন্ত্র মন্ত্র উপাসনা
জানি না কোনো সাধনা
'মা' নামে তোর আরাধনা
করব এবার প্রাণ-পণে।

(সারদা-সঙ্গীত, পৃষ্ঠা ৫৮)

সাধক-কবির মাকে পাওয়ার একমাত্র পথ ও পাথেয় হল গান—

গানে গানে লয়ে তানে
থাক মা জেগে আমার প্রাণে
লীন হয়ে যাই মা তোর নামে
কাজ কি মোর অন্য সাধনে।। (প্রাগুক্ত)

মা কখনো কারো একার হন না। তিনি সাধু-সজ্জন, অসাধু-দুর্জন সকলের মা, সে-কথা স্বামী চণ্ডিকানন্দ অনাবিল ভাষায় উচ্চারণ করেছেন—

সাধু সজ্জন-জননী তুমি মা
অসাধু দুর্জনও সুত তোমার
বহে নিরন্তর অন্তহীন ধার
তব অনন্ত করুণাধার।। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬)

মিথ্যা যতই মোহন বেশ ধরে আসুক, আমরা যেন মায়ের চরণসেবায় অচল থাকি। কারণটি সাধক চণ্ডিকানন্দ আমাদের জানিয়েছেন—

তুমি মোদের প্রাণের প্রাণ
তুমি মোদের ধ্যান জ্ঞান
তোমার তরে গেয়ে গান
যেন মোদের জীবন যায়।।

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৬)

এবার ভোগ নয়, ত্যাগ। এবার ব্যষ্টি-চিন্তা নয়, সমষ্টির চিন্তা। আর জগৎপ্রপঞ্চে ডুবে থাকা নয়। শুদ্ধ, মুক্ত, চৈতন্যময় হয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা হবে—

ত্যাগের মন্ত্র দাও মা আমায়
তোমার কাজে প্রাণ যেন যায়
বদ্ধ যেন হই না মা আর
মায়ার এ সংসারে।। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৭)

চণ্ডিকানন্দের 'বিবেকানন্দ-লীলাগীতি' (দুটি পর্ব ও পরিশিষ্টে দশটি 'বিবেকানন্দ সঙ্গীত', প্রকাশকাল জুলাই ১৯৬২) তাঁর সারা জীবনব্যাপী সংগীতসাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বহু ব্যক্তির অনুরুদ্ধতায় বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষে সংগীতগুলি রচিত হয়েছিল। অশ্বিনীকুমার শর্মা এই গ্রন্থের কথিকা অংশগুলি লিখে দেন। আবার নানা জনের রচিত সংগীত তিনি রিক্‌থতায় নিজের গ্রন্থে গ্রহণ করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) রামকৃষ্ণের (১৮.২.১৮৩৬-১৬.৮.১৮৮৬) লীলা সংবরণের পর তাঁকে 'জীবন-পথের ধ্রুবতারা', 'নয়নের মণি প্রাণের প্রাণ' হিসেবে অনুধ্যান করতেন। বিবেকানন্দের সংকল্পের এই কথা স্বামী চণ্ডিকানন্দ ভাষা-সুরে সংগীতের আবহে রূপ ও বাণী দিয়েছেন—

নিজ সুখ-আশা দিব বিসর্জন
জীব-সেবা লাগি ধরিব জীবন
নরের মাঝারে পূজি' নারায়ণ,

গেয়ে যাব মহামিলন গান।।

(বিবেকানন্দ-লীলাগীতি, প্রথম পর্ব, পৃষ্ঠা ২৭)

আসল কথা, এ তো সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদীর আত্মনিবেদন। বিবেকানন্দের সাধনাই ছিল জীবসেবা। নর-নারায়ণ জ্ঞানে সকলের মঙ্গল সাধন। বিবেকানন্দের এই গভীর বাণী চণ্ডিকানন্দ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর কণ্ঠে সংগীতের ভাষা উচ্চারিত হয়েছিল পরম পবিত্রতায়—

জীব-সেবা তরে সঁপিব নিজেরে যতদিন দেহে থাকিবে প্রাণ।
ভজন সাধন তনু-মন-প্রাণ নিঃশেষে সবই করিব দান।।
ইহপরকালে সুখের বাসনা
আপনার লাগি কিছু রাখিব না
যায় যদি দেহ তবু থামিব না
সাধিব সদাই জীব-কল্যাণ।।

(প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় পর্ব, পৃষ্ঠা ৪২)

সকল মানুষ তো ব্রহ্মস্বরূপ। তাহলে কেন বোধহীন জাতপাতের সংকীর্ণ ভেদাভেদ? তাই বিবেকানন্দের দৃপ্ত কণ্ঠের বাণী চণ্ডিকানন্দের গানে ভাষা পায়—

অত্যাচারী অভিজাত! তুমি আজ লীন হয়ে যাও।
উঠুক জাগিয়া আজি নতুন ভারত, তোমার যা আছে তারে দাও।।
চাষা জেলে মালা মুচি জাগুক এবার
ঝোড় জঙ্গল ভেদি', ভেদিয়া পাহাড়
'ওয়াহ্ গুরু কী ফতে' করি হুংকার
জাগুক নারায়ণ, পথ ছাড়ি দাও।।

স্বামী চণ্ডিকানন্দের 'বিবেকানন্দ-লীলাগীতি'র পরিশিষ্ট অংশের 'বিবেকানন্দ-সঙ্গীত' স্বামীজির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। তাঁর চরিত্রের স্বরূপটিও আমাদের কাছে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়। যেমন—

বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ ঐ যে ডাকিছে আয় রে আয়।
আহ্বানে তাঁর আপনা ভুলিয়া কত মহারথী ছুটিয়া যায়।।
আত্মত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন তন্ত্রে
ভোগবাদ-জাত দানব দলিতে আপনা সঁপিতে কে যাবি আয়।।
স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-ভোগ-কোলাহল এনেছে জগতে শুধু হলাহল
নিভোতে আজিকে এই দাবানল প্রেমবারি সে যে এনেছে হায়।
এসো দেব এসো করুণা-নিধান লহ আজি মম তনু মন প্রাণ
কৃপা করি কর এ আশিস দান তব কাজে যেন জীবন যায়।।

(বিবেকানন্দ-সঙ্গীত, সংখ্যা ২, পরিশিষ্ট বিভাগ, পৃষ্ঠা ১)

'বিবেকানন্দ-সঙ্গীত'-এর দশটি গানে 'বিবেকানন্দ বিবেকভাস্কর', 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ'-এর জীবনকথা ও কর্মসাধনার সংগীতময় প্রতিবেদনে আমরা অনুশাসিত হই। যা-ই হোক, এ-পর্যন্ত গেল 'বিবেকানন্দ-লীলাগীতি'-র কথা। এবার 'সারদা-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গীতি'-র গ্রন্থ-কথা।

'সারদা-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গীতি' গ্রন্থটিতে (প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) মোট ২৩১টি সংগীত রয়েছে। এই সংগীতগুলি চারটি বিভাগে বিভক্ত। বিভাগগুলি হল ক) শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত (পৃষ্ঠা ১-২৭, সংগীতসংখ্যা ৫০), খ) শ্রীসারদা-সঙ্গীত (পৃষ্ঠা ২৮-৮০, সংগীতসংখ্যা ১১৬), গ) শ্রীবিবেকানন্দ-সঙ্গীত (পৃষ্ঠা ৮১-৯৬, সংগীতসংখ্যা ৩৮), ঘ. বিবিধ সঙ্গীত-স্বদেশ বন্দনা (পৃষ্ঠা ৯৬-১০৭, সংগীতসংখ্যা ২৫)। গ্রন্থারম্ভে দুটি সংগীত ('নমো কামারপুকুর জয়রামবাটী ধাম' ও 'কামারপুকুরে চল মন') আছে। এই গ্রন্থের কোনো কোনো সংগীত চণ্ডিকানন্দের অন্য সংগীত থেকে অনুবৃত্তি লাভ করেছে। এখানে ত্রিরত্নের প্রতি (সারদা-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ) স্বামী চণ্ডিকানন্দের শ্রদ্ধাবনত চিত্তটি আমাদের বিনম্র করে। এঁদের মানবপ্রীতির কথায় আমরা আপ্লুত হই। ভগবানকে পাওয়ার ইচ্ছামন্ত্রটির ঋজু ভাষা ও ভাব আমাদের হৃদয়ের জারক রসে জারিত হয়ে অপার আনন্দ দেয়। চণ্ডিকানন্দ লিখেছেন—

চাও যদি ভগবান
আগে আপনারে অপরের তরে নিঃশেষে কর দান।।
লভিতে শক্তি সাধ যদি হয়, লোকের সেবায় কর দেহ ক্ষয়,
পাইবে শান্তি হবে নির্ভয়, পূরিবে মানস-কাম।।

(শ্রীবিবেকানন্দ-সঙ্গীত, সংখ্যা ২৭, পৃষ্ঠা ৯২)

'বিবিধ সঙ্গীত-স্বদেশ বন্দনা'-র শেষ গানটি (২৫ সংখ্যক) আমাদের আন্তর্জাতিকতা বোধে উন্নীত করে। বিশ্বের প্রখ্যাত ধর্মগুরু, যাঁদের কালে কালে মর্তধামে আবির্ভাব জনগণের মধ্যে কল্যাণ-সংহতি-শান্তি এনেছিল, তাঁদের পবিত্র নাম ও কর্মকথা সংগীত-সাধক চণ্ডিকানন্দ শ্রদ্ধায় উক্ত সংগীতে উচ্চারণ করেছেন।

এই গানে ভবভয়হারী-ধর্মসমন্বয়কারী রামকৃষ্ণ, রাজধর্ম সংস্থাপক রামচন্দ্র, পূর্ণ মনুষ্যত্বের আধার শ্রীকৃষ্ণ মুরারি, জীব উদ্ধারক-নির্বাণ প্রচারক বুদ্ধদেব, জ্ঞানমূর্তির প্রতিরূপ শংকরাচার্য, জীবহিতকারী রামানুজাচার্য, শুদ্ধা ভক্তির বিগ্রহ— অদ্বিজচণ্ডালপ্রেমিক গৌরহরি, শিখ ধর্ম সংস্থাপক শ্রীগুরু নানক ও চিন উদ্ধারক লাউৎজে কনফুসিয়াস সকলেই আছেন। এ-ছাড়া আছেন—

জীবে দয়া শিখাইলে যীশু রূপ ধরি'
মোহম্মদ মানব-সাম্য প্রবর্তনকারী।।
শ্রীবিবেকানন্দ জয় বেদান্ত-কেশরী,
নব যুগে সর্ব যোগ সংস্থাপনকারী।।

সবশেষে এই সাধকের আকুল প্রার্থনা—

যুগে যুগে যত ঋষি আসিলে ভুবনে
দয়া করে পদরেণু দাও অভাজনে।।

স্বামী চণ্ডিকানন্দের 'পাঞ্চজন্য' একটি উল্লেখযোগ্য সংগীতগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে আছে— হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য, অর্জুন দেবদত্ত ও ভীমকর্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খধ্বনি করেছিলেন। কৃষ্ণের শঙ্খের নাম হল পাঞ্চজন্য। সমুদ্রে বাসকারী পঞ্চজন নামক অসুরকে বধ করে তার অস্থিতে তিনি এই শঙ্খ নির্মাণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র পাঞ্চজন্য শঙ্খের কথা মনে রেখে সাধক-সংগীতজ্ঞ এই গ্রন্থটির পাঞ্চজন্য নাম রেখেছিলেন। 'পাঞ্চজন্য' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় চণ্ডিকানন্দ পাঞ্চজন্যের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে একটি গান রচনা করেছিলেন। এই গানের প্রথম দুটি চরণ হল—

পাঞ্চজন্য শোন, শোন সবে পাতি কান
আবার আসিল নামি', আসিল রে ভগবান।

এই কথার দ্যোতনা পাই স্বামী গম্ভীরানন্দের কথায়— "স্বামীজির মতে আধুনিক যুগে দরকার উচ্চ ভাবাত্মক, বীরত্ব ব্যঞ্জক সঙ্গীত—যার দ্বারা মোহ কাটে, জড়তা ছোটে, আর দিশেহারা মানব খুঁজে পায় জীবন-সঙ্গীতের মূল তান। কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গীতা শুনিয়ে প্রিয় সখা অর্জ্জুনের ক্লীবতা নাশ করেছিলেন; আর আজকে এই হতভাগ্য জাতিকে অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষিত করতে দিব্যবাণী নিয়ে এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

"কৃষ্ণের পাঞ্চজন্যের নাম ধারণ করে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার গানগুলি সেই দিব্য মাভৈঃ বাণীরই প্রতিধ্বনি জাগাচ্ছে আমাদের হৃদয়ে। সেই ভাব, সেই ভাষা, সেই তেজ, সেই আশাকে কবি রূপ দিয়েছেন সুরে-তালে-লয়ে-মানে। নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বামীজীর প্রতি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি সময়োচিত ও সার্থক হয়েছে।" [ভূমিকা, পাঞ্চজন্য— বিবেক-গীতি, প্রথম প্রকাশক : স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ : বিবেকানন্দ শতবার্ষিক বর্ষ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬+৪৭+১ (বিজ্ঞাপন)]

স্বামী চণ্ডিকানন্দের এমন কোনো প্রাণপ্রদ বিষয় নেই যা তাঁর সুললিত সংগীত-প্রবাহে রূপ পরিগ্রহ করেনি। বলা বাহুল্য, রসোত্তীর্ণ এই পাঞ্চজন্য সংগীত-গ্রন্থখানি আমাদের দেশের সংগীত ও সাহিত্য-ভাণ্ডারের পরম সম্পদ। এই পাঞ্চজন্য গ্রন্থের (তৃতীয় মুদ্রণ, মে ২০১১) সব কথাই পূর্ব আলোচনায় উঠে এসেছে। শুধু 'গুরুসঙ্গীত' নিয়ে সামান্য যেটুকু বলা চলে তা হল, এখানে চণ্ডিকানন্দের বিনয়াবনত রূপ আমাদেরও শ্রদ্ধায় মাথা নত করায়। এখানে মাত্র চারটি সংগীত সংকলিত হয়েছে। সব সংগীতের এক কথা এক সুর। পরমেশের কাছে 'বিষয়-বাসনা' থেকে তিনি মুক্তি চান। এখন তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনা 'তোমাতে এ চিত কর নিমগন মিশে যাই চিরতরে।।' (পাঞ্চজন্য, প্রাগুক্ত সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১২৮, সংগীত সংখ্যা ৩০২)

স্বামী চণ্ডিকানন্দ গীতিকার ও সুরকার। তাঁর 'ভজন সঙ্গীত' (স্বরলিপি) সপার্ষদ সারদা-রামকৃষ্ণ বন্দনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি সহজ ভাষায়, অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের জীবন-সংগীত রচনা করেছেন। সহজ ও মর্মস্পর্শী ভাষায় সংগীতগুলির সময়োপযোগী সুরও নির্দেশ করে দিয়েছেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, "'সপার্ষদ সারদা-রামকৃষ্ণ বন্দনা' সঙ্গীত গ্রন্থটি রচনা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে একান্ত পরিচিত এবং সঙ্গীতজ্ঞানী স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ। তাঁর রচিত সঙ্গীতগ্রন্থ অনেকগুলি আছে, তাদের মধ্যে 'পাঞ্চজন্য' ২য় সংস্করণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য—এতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ জননী শ্রীশ্রীসারদা দেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণের সকল অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রভৃতি আত্মজ্ঞান বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের উদ্দেশ্যে রচিত সঙ্গীত সমূহের অন্তর্নিবেশ আছে। তাহা ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থের

চিরবরেণ্য শ্রীম বা মহেন্দ্র গুপ্তের উদ্দেশ্যেও একটি সঙ্গীত আছে। এ ধরনের ভক্তি-সঙ্গীতগ্রন্থের একান্ত অভাব। সঙ্গীতজ্ঞানী স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ সেই অভাব পূর্ণ করেছেন, এজন্য তাঁর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।" (ভজন সঙ্গীত-স্বরলিপি-সপার্ষদ সারদা-রামকৃষ্ণ বন্দনা গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত, তারিখ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, স্থান কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ) এরপর এই গ্রন্থ সম্পর্কে আর কিছু বলার থাকতে পারে না।

স্বামী চণ্ডিকানন্দের রচিত সাবলীল গানগুলি মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল। সাঁওতাল, খাসি, নাগা, মিজো, মিকির, মিরি, রাজবংশী, মণিপুরি, নেপালি প্রভৃতি পর্বতবাসীর কাছেও তিনি সমাদর লাভ করেছিলেন। ভারতের বাইরেও তাঁর রচিত গানগুলি প্রশংসা অর্জন করেছিল।

কিন্তু বাঙালি বড় আত্মবিস্মৃত জাতি। স্বামী চণ্ডিকানন্দকে আমরা মনে রাখিনি। তাঁর কর্মকাণ্ড ও সংগীতসাধনার বিষয়টি তো অনেক দূরের কথা। আত্মবোধে বিষয়ী ও বিষয়কে গ্রহণ করা আমাদের স্বভাবে নেই। হেতু যখন মুরুব্বি হয়ে বুদ্ধিকে গ্রাস করে তখনই আমরা আলোচনায় তন্নিষ্ঠ হই। তাই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯.৯.১৯০৩-২৯.১.১৯৭৬) কথাকে নিজের মতো করে নিয়ে স্বামী চণ্ডিকানন্দ সম্পর্কে বলতে পারি— দেশলাই জ্বেলে সূর্যকে দেখানো যায় না, কিন্তু গৃহকোণে পুজোর প্রদীপটি হয়তো জ্বালানো যায়। আমার এই লেখা শুধু সেই দীপ-জ্বালানো পুজো, দীপ-জ্বালানো আরতি। ❑